

## ব্যাংকের সুদ কি হালাল

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সূচি ও বিবরণ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুস্তাক আহমাদ কারীমী

### ২- ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও ব্যাংকের সুদ

ব্যাংকের সুদকে হালালকারিগণ এই বলেন যে, কুরআন ও হাদীসে যে সুদকে হারাম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা হল সেই ঋণের উপর সুদ--যা মানুষ তার ব্যক্তিগত অভাব ও প্রয়োজন দূরীকরণের উদ্দেশ্যে (ঋণ) গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন মিটানো বা ক্ষুণ্ণিবারণের উদ্দেশ্যে অথবা ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঋণ করে যে সুদ দিতে হয়, সেই সুদই ঋণদাতার পক্ষে হারাম। কারণ এতে গরীব শোষণ হয় এবং অভাবীর অভাবকে অর্থকরী সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর সুদখোর বলে, ‘যদি তুমি একশ টাকায় মাসে ১০ টাকা হারে সুদ দাও তাহলে আমি ঋণ দেব।’ পরন্তু অভাবী মানুষ বাধ্য হয়েই সেই চুক্তিতেই ঋণ গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেওয়া হয়, তার সুদ হারামের আওতাভুক্ত নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে অভাবী বা গরীব শোষণ হয় না। বরং উভয় পক্ষই এ ঋণে লাভবান হয়।

ডক্টর নূরুদ্দীন ইব্র লিখেছেন, সাম্প্রতিককালে কোন কোন ব্যক্তি বলে থাকেন যে, কুরআন শুধু মাত্র সেই ঋণভিত্তিক সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে যা একজন অভাবী ও উপায়হীন মানুষ ঋণের উপর আদায় করতে বাধ্য হয়। যাকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীর ঋণভিত্তিক সুদকে হারাম করা হয়নি; যা মুনাফা কামানোর উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের উপর আদায় করা হয়; যাকে বাণিজ্যিক ঋণ বলে আখ্যায়ন করা হয়। (এবং কুরআন অবতীর্ণকালে এরূপ বাণিজ্যিক সুদ প্রচলিত ছিল না।)

বলা বাহুল্য, এটি (সুদ হারামের) আয়াতের তফসীরে একটি অভিনব রায়। এই রায় পোষণ করে ওঁরা কুরআন মাজীদের স্পষ্ট উক্তিকে অকেজো ও বেকার করে ছেড়েছেন! উপরন্তু ১৪ শতাব্দী ধরে উলামায়ে তফসীর, উলামায়ে ফিকহ, উলামায়ে লুগাহ (আরবী ভাষাবিদগণ) তথা ইসলামের ঈমামগণ উক্ত আয়াতের যে মমার্থ উপলব্ধি করেছেন, ওঁরা তার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু আমরা ওঁদেরকে চ্যালেঞ্জ করে দাবী করছি যে, ওঁরা পূর্ব অথবা পরবর্তী উলামাদের কারো একটি উক্তি, নতুবা কমপক্ষে তার কাছাকাছি কোন ইঙ্গিত, অথবা নিম্নমানের কোন আলেমেরই কোন উক্তি তাঁদের এ অভিমতের সমর্থনে পেশ করুন।[1]

হ্যাঁ; চৌদ্দ শত বছর অতিবাহিত হল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন আলেম ফকীহ বা ইমাম এ কথা বলে যান নি (যে, বাণিজ্য-ভিত্তিক ঋণের সুদ উক্ত হারামের আওতাভুক্ত নয়)। যখন থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে রাজত্ব শুরু করেছে, তখন থেকে এ কথা বলা শুরু হয়েছে। অথচ এই নতুন অপব্যাক্য্য কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তিসমূহকে বিনা দলীলে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সঠিক ইতিহাস উক্ত অপব্যাক্য্যর খন্ডন করে। কারণ জাহেলিয়াতের যুগে যে সুদ প্রচলিত ছিল তা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অভাবপূরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত এমন ঋণভিত্তিক সুদ ছিল না; যা সে যুগের লোকেরা নিজেদের পানাহার বা ব্যক্তিগত অভাবপূরণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করত এবং তার উপর সুদ আদায় করত। এ কাজ আরবদের সাধারণ প্রকৃতির পরিপন্থী ছিল। হ্যাঁ, সে যুগে এ ধরনের সূদী ঋণ যদিও প্রচলিত ছিল; তবে তা ছিল বিরল ঘটনা। বস্তুতঃ সে

যুগে যে সুদ বহুল প্রচলিত ছিল, তা হল সেই বণিকের সুদ; যারা কুরআন মাজীদের বিবৃতি অনুযায়ী একবার শীতকালে এবং অন্যবার গ্রীষ্মকালে বাণিজ্যিক কাফেলারূপে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করত। (সূরা কুরাইশ দ্রষ্টব্য) লোকেরা ধনবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে অংশীদারী বা পার্টনারশিপ হিসাবে এ সকল কাফেলাকে নিজেদের অর্থ ব্যবসায় লাগাতে দিত। অথবা তাদেরকে ঋণ স্বরূপ অর্থ প্রদান করত এবং তার মুনাফা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে নেওয়া হত; যার অপর নাম ছিল সুদ। এই শ্রেণীর সুদ ছিল নবী করীম (ﷺ)–এর চাচা আববাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রায়িয়াল্লাহু আন্হুর। যা তিনি বিদায়ী হজ্জের সময় বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন। কোনও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ কথা কল্পনাও করতে পারে না যে, আববাস (রাঃ); যিনি জাহেলিয়াত যুগে নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দ্বারা হাজীদেরকে পানি পান করাতেন, তিনি লোভাতুর ইয়াহুদীদের মত ব্যবহার প্রদর্শন করতেন এবং কোন ব্যক্তি তার নিজের ব্যক্তিগত অভাব অনটনের ফলে তাঁর নিকট ঋণ চাইতে এলে তিনি তাকে বলতেন, ‘আমি সুদ ছাড়া তোমাকে ঋণ দিতে পারব না।’

যদি এ কথা তর্কহলে মেনেও নেওয়া হয় যে, আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের হারামকৃত সুদ কেবলমাত্র ব্যক্তিক অথবা পারিবারিক প্রয়োজনে গৃহীত ঋণভিত্তিক সুদই ছিল; যেমন আধুনিককালের কতক দাবীদারের দাবী, তাহলে সুদদাতাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভিশাপ দেওয়ার কারণ কি হতে পারে? আর এ কথা কি কল্পনাও করা যেতে পারে যে, একজন অনাহারক্লিষ্ট উপায়হীন অসহায় মানুষ যখন নিজের তথা নিজের ক্ষুধার্ত সন্তান-সন্ততির অন্নসংস্থানের উদ্দেশ্যে কারো নিকট ঋণ করে এবং সে তার উপর সুদ প্রদান করে, তখন তাকেও আল্লাহর প্রিয়তম নবী (ﷺ) অভিশাপ দেবেন? বরং এ ধরনের উপায়হীন প্রয়োজনে তো আল্লাহ এবং তদীয় রসূল (ﷺ) হারামকৃত মৃত জন্তু, রক্ত এবং শুকরের মাংস খাওয়াকেও বৈধ ঘোষণা করেছেন; আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (মৃতজন্তু, শুকরের মাংস ইত্যাদি হারামকৃত বস্তু ভক্ষণ করতে) অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না।[2]

পক্ষান্তরে এ কথাও প্রকৃত বাস্তব থেকে বহু ক্রোশ দূরে যে, ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগমূলক কর্মে অর্থ লাগিয়ে তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ব্যাংকসমূহের বাজেট ও কার্য-বিবরণী সংক্রান্ত আলোচনা পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন যে, ব্যাংক মৌলিকভাবে কেবলমাত্র ঋণদানের কাজ করে থাকে। এর মূল কারবার ক্রয়-বিক্রয়, কৃষিকার্য, শিল্পায়ন, ব্রিজ ও অটালিকা নির্মাণ প্রভৃতি নয়। একে সংক্ষিপ্ত ভাষায় এও বলতে পারেন যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আসল কারবার হল, যায়দ, উমার, বকরের নিকট থেকে স্বল্প (প্রায় ৮ শতাংশ) হারে সুদের উপর ঋণ নিয়ে অপরকে অধিক (প্রায় ১৫ শতাংশ) হারে ঋণ প্রদান করা। আর এ দুই হারের মধ্যবর্তী অবশিষ্ট অংশ (প্রায় ৭ শতাংশ) ব্যাংকের মুনাফা। এটাই হল ব্যাংকের আসল কারবার এবং মৌলিক বৃত্তি। এইভাবেই ব্যাংক বড় আকারের চক্রবৃদ্ধিহারে সুদী কারবার করে থাকে, যা জাহেলিয়াত যুগের ছোট ছোট মহাজনরা করত। এ কথাও বলা যায় যে, ব্যাংক হল সুদের এজেন্ট ও দালাল; যে সুদ দেয় এবং নেয়ও।

আর এই ধারণাও নিশ্চিতভাবে সঠিক নয় যে, ব্যাংক কখনোই নোকসান ও ক্ষতির শিকার হয় না; বরং সর্বদাই ব্যাংক লাভ অর্জনই করে থাকে। আমরা সংবাদপত্রে কত দেশের ব্যাংকের ব্যাপারে পড়েছি যে, তা দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। সেই আমেরিকা যাকে ব্যাংক ও পুঁজিপতিদের দেশ বলা হয়, শুধুমাত্র সেখানেই ১৯৮৭ সালে ১৪৭টি

ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়ার খবর সংবাদ-পত্রে প্রকাশ হয়। পুনরায় ঠিক তার পরবর্তী ২ বছরেও প্রায় অতগুলো ব্যাংকেরই দেউলিয়া হয়ে পড়ার কথা খবরের কাগজে বের হয়। [3]

পরন্তু যদি আমরা এ কথা মেনে নিই যে, ব্যাংকের কোন প্রকার নোকসান ও ক্ষতিই হয় না---যেমন আমাদের কতিপয় ভাই বলে থাকেন- তাহলে ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রেও কি তাঁরা এ একই কথা বলবেন যে, তাদেরও কোন প্রকার নোকসান হয় না? (সর্বদা লাভই হয়?) সুতরাং যদি ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহীতাদের নোকসান হয়---যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতা তার সাক্ষী---তাহলে তারা একাকী কেন নোকসান বহন করবে এবং ব্যাংক সর্বক্ষেত্রে কেবল লাভ অর্জন করবে? এটা কি ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা? বিবেক কি এমন একতরফা বিচারকে বৈধ ও সঠিক বলে মেনে নিতে পারে? আমরা যদি কেবল ঋণের বিপত্তির দিকে লক্ষ্য করি তাহলে এ ব্যাপারে বিভিষিকাময় দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে। যে ঋণ তৃতীয় বিশ্বের কোমর ভেঙ্গে পঙ্গু অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এমন কি কেবল মিসরের মত একটি দেশের ঋণ চার হাজার চার শ' (৪৪০০০,০০০,০০০) কোটি ডলারে গিয়ে পৌঁছেছে! যার সুদ ১০% হারে ধরা হলে চার শ' চল্লিশ কোটি ডলার হয়। অথচ কিছু ঋণের সুদ ১০% থেকেও বেশী। যে ঋণ পরিশোধ করতে মিসর অক্ষম।

এই প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ঋণের ডিউটি আদায়; অর্থাৎ আসল কিস্তী সহ অতিরিক্ত বার্ষিক সুদের টাকা পরিশোধ করা। আর এই ভয়াবহ পরিস্থিতিই বড় বড় শক্তিশালী বহু দেশেরই মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলেছে। সুতরাং ভারত-পাকিস্তানের মত উন্নয়নশীল দেশের কি অবস্থা তা অনুমেয়। ঋণের ব্যাপারে একটি আরবী প্রবাদ আছে যে, *هم بالليل ومذلة بالنهار* অর্থাৎ, ঋণের কারণে দুশ্চিন্তায় রাতের নিদ্রা হারাম হয়ে যায় এবং দিনে অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়।

আর এ হাল তো কেবল ঋণের। এবারে ঋণের সাথে তার সুদ যোগ হলে কত যে নাজেহাল হতে হয়, তা বলাই বাহুল্য। যে সুদ দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে এবং কম হওয়ার কোন নামই নেয় না।

সুদে দু'টি মসীবত সমবেত হয়; এক তো ঋণের বোঝা আর দ্বিতীয় হল ঋণদাতার অনুগ্রহ-পদে দলিত হওয়া। আমরা বিশ্বব্যাংক এবং পাশ্চাত্যের ঋণদাতা দেশগুলোর আধিপত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কি লক্ষ্য করছি না যে, কিভাবে তারা আমাদের রুজী-রুটী ও খাদ্যসম্ভারের উপর আধিপত্য জমিয়ে বসে আছে? এবং কিভাবে তারা আমাদের রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির উপর তাদের শাসন-ক্ষমতা অব্যাহত রেখেছে?

## ফুটনোট

[1] (আল-মুআমালাতুল মাসরাফিয়াহ ৭৩পৃঃ)

[2] (সূরা বাকারাহ ১৭৩ আয়াত)

[3] (ফাওয়াইদুল বুনুক হিয়ার রিবাল হারাম, ডক্টর ইউসূফ কারযাবী ৩৫ পৃঃ)

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন